নব আলোকে নিবেদিতা

পার্থসারথি গায়েন

• প্রাপ্তিস্থান •

গীতাঞ্জলি

ভবানী দত্ত লেন, স্টল নং-২৬, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

সূচিপত্র ঃ-

শৈশব	১ - ৮
কৈশোর	৯ - ১৯
স্বামীজীর সান্নিধ্যে	২০ - ৩৩
কলকাতায়	৩৪ - ৪০
সারদা দেবীর সাথে সাক্ষাৎ	৪০ - ৪২
দীক্ষা	৪২ - ৪৪
অমরনাথ ভ্রমণ ও ক্ষীরভবানী দর্শন	৪৫ - ৫৯
স্কুল স্থাপন	৬০ - ৭০
খুকির মা ও মায়ের খুকি	৭১ - ৭৯
কালী ও দ্বিজ নিবেদিতা	৮০ - ৯৮
বজ্রদৃঢ় শিক্ষক ও অগ্নি শিখা ছাত্রী	৯৯ - ১১২
ধ্যানের ভারতবর্ষ ও ব্যক্তি নিবেদিতা	১১৩ - ১১৭
ভারতের বিপ্লববাদ ও নিবেদিতা	১১৮ - ১২০
নিবেদিতার লেখালেখি	১২১ - ১২২
নিবেদিতা ও ভারতীয় মনীষীগণ	১২৩ -১৩৩
বিদায়	১৩৩ - ১৩৮

নব আলোকে নিবেদিতা

পার্থসারথি গায়েন

কোন আলোকে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের আকাশে তখন শরতের শুভ্রতা। বাতাসে স্নিগ্ধতার আমেজ। কাশফুলের লুটোপুটি বনের পথে পথে। দোল খাওয়া ধানের শিষের পরে শিশিরের নোলক। এমনই এক মধুময় মুহূর্ত। ভারতবর্ষ থেকে বহুদূরে উত্তর আয়ার্ল্যান্ডের টাইরন প্রদেশে ডানগ্যানন নামক ছোট্ট শহরে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর জন্ম নিলেন ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সেবিকা – বান্ধবী – সন্তান – মার্গারেট। পিতামহীর নাম মাগার্রেট এলিজাবেথ নীলাস অনুসারে তার নাম হলো মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। পিতা স্যামুয়েল রিচমন্ড নোবল এক গীর্জার ধর্মযাজক। তিনি অত্যন্ত আদর্শবাদী, সৎ ও ধর্মনিষ্ঠ। মা মেরী ইজাবেল হ্যামিলটন ছিলেন অত্যন্ত ভক্তিমতী, কষ্টসহিষ্ণু ও শান্ত প্রকৃতির। সন্তানের জন্মের আগে তিনি খুব ভয়ে ভয়ে থাকতেন। প্রথম সন্তান, কি জানি কি হয়! তিনি মনে মনে সন্তানের মঙ্গল কামনায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন – হে পরম পিতা, আমার সন্তান যদি ভালোভাবে জন্ম নেয় তবে তাকে আমি তোমার সেবায় নিয়োজিত করবো।

মেয়ের চৌকস মুখ, ধারালো চোখ, ছোট্ট শরীর, দৈবী ভাবে পরিপূর্ণ। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু–বান্ধব, সবাই খুশি। ছোট্ট মার্গারেট একটু একটু করে বড় হয় আর তার মায়ের ব্যস্ততা বাড়ে। মা মেরী ইজাবেল অত্যন্ত দায়িত্বশীল। স্বামীর যাজন কাজে সহায়তা করা, সংসারের সমস্ত

কাজ ও ছোট্ট মার্গারেট–এর দেখভাল তিনি অত্যন্ত সুচারুভাবে করেন হাসি মুখে। মার্গারেট অত্যন্ত জেদী ও প্রাণচঞ্চল। সে সব সময় চায় মা তার কাছে কাছে থাকুক। মা চোখের আড়াল হলেই কান্না। মা বকা দিলে সে ফুলে ফুলে কাঁদে। কিন্তু মজার ব্যাপার কাঁদলেও তার চোখ দিয়ে খুব কম সময়ই জল পড়ে। মেয়ের বাবা–মায়ের সঙ্গ ছাড়া আর তেমন কোন বায়না নেই অন্য বাচ্ছাদের মতো। মার্গারেটের বাবা তাকে খুবই ভালোবাসেন। মেয়ের ঠোঁট ফুলছে দেখলেই তিনি ছুটে এসে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে নেন। – ওলে বাবালে – ওলে বাবালে বলে মার্গারেটের গায় মাথায় হাত বুলিয়ে দেন, ছোট্ট গালে গাল ঘষে আদর করেন। অমনি মার্গারেটের কান্না চৌপট। চোখের কোনে জল চিকচিক, মুখে ফুটন্ত গোলাপ হাসি। বাপের বুকে মাথা রেখে ছোট্ট আঙুল দিয়ে আঁকিবুকি কাটতে কাটতে কখন ঘুমিয়ে পড়ে অঘোরে। বাপ কাজে বেরিয়ে গেলে মেয়ের সারাদিন কান খাড়া। কখন বাবা ফিরবে। পুঁচকে মেয়ে বাপের পায়ের শব্দ ঠিক চিনতে পারে। বাপ ঘরে ঢুকলেই কিছুক্ষণ মেয়ের কাছে বন্দী। তখন আর অন্য কোন দিকে মন নেই। বাপকেও সে অন্য মনস্ক হতে দেয়না। বকম বকম করে। মা বলে যে বাড়িতে আর একটি প্রাণী আছে তখন খেয়ালই থাকেনা তার। বাবা খাইয়ে না দিলে খায় না। তার মা কোন কোন দিন অনুযোগ করে – মেয়ের ভাব দ্যাখো, সারাদিন আমি কষ্ট করে খাওয়াই পরাই আর বাপ এলে আমি পর, চিনতেই পারেনা। বাপ হাসে। মেয়েও সে হাসিতে না বুঝে যোগ দেয়।

তবে বাপের এই সোহাগ তার বেশি দিন স্থায়ী হলো না। যাজকের সংসারে সম্মান ছিল। কিন্তু আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না তেমন। অর্থ রোজগারের আশায় স্যামুয়েল রিচমন্ডকে ডানগ্যানন শহর ত্যাগ করে পরিবার সহ ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেষ্টার শহরে চলে যেতে হবে। নতুন

জায়গা। আয় অনিশ্চিত। অভাব নিত্যসঙ্গী। স্যামুয়েল রিচমন্ড ও ইজাবেল যুক্তি করে ঠিক করল বড় মেয়ে মার্গারেট কিছুদিন তার পিতামহীর কাছে থাক। তাতে তারা কিছুটা নিশ্চিন্ত থাকবে। মার্গারেটও ভালো থাকবে। কিন্তু বাদ সাধলো মার্গারেট নিজে। ভাবে ভঙ্গিতে বোঝাল সে কিছুতেই বাপ-মায়ের কাছ ছাড়া হবেনা। বাপ পড়লেন মহা ফাঁপরে। কি করা যায়। রিচমন্ডের মনও সায় দিচ্ছে না মেয়েকে ছেড়ে যেতে। সারা দিনের কাজের শেষে মেয়েটা তার স্বস্তি! তৃপ্তি! শান্তি! ঘরে এসে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরলে তার সব ক্লান্তি দূর। কিন্তু উপায়ই বা কি! তিনি মেয়েকে কোলে নিয়ে খুব মিষ্টি করে বললেন- আমার সোনা মেয়ে মার্গারেট, একটা ভালো বাড়ি ঠিক করেই খুব তাড়াতাড়ি তোমাকে নিয়ে চলে যাব। তত দিন গ্র্যান্ডআন্ট-এর কাছে লক্ষী মেয়ে হয়ে থাকবে। ছোট্ট মার্গারেট বাপের মুখের দিকে কিছুক্ষন তাকিয়ে কী যেন বোঝবার চেষ্টা করল। তারপর সত্যি সত্যি লক্ষী মেয়ের মতো যেন মাথা নেড়ে বলল - ঠিক আছে। বাপ মায়ের বুক থেকে একটা গুরু ভার নেমে গেল। তাঁরা নিশ্চিন্তে নতুন কর্মস্থলে রওনা হলেন।

মার্গারেটের পিতামহ রেভারেন্ড জন নোবলের পূর্বপুরুষ স্কটল্যান্ড পরিত্যাগ করে আয়ার্ল্যান্ডে রষ্টেভর শহরে স্থায়ী ভাবে বসবাস করেন। জন নোবল ছিলেন আয়ার্ল্যান্ডের এক গীর্জার ধর্মযাজক। ধর্মে যেমন তাঁর অচল ভক্তি তেমনি স্বদেশের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। ইংল্যান্ডের অপশাসনের বিরুদ্ধে আয়ার্ল্যান্ডের মুক্তি সংগ্রামে তিনি যোগ দিয়েছিলেন সক্রিয়ভাবে। তাঁর স্ত্রী মার্গারেট এলিজাবেথ নীলাস ছিলেন স্বামীর যোগ্য সহধর্মিনী। স্বামীকে সব ব্যাপারে পরামর্শ ও সাহচর্য দিয়ে সাহায্যে করতেন। তিনি কোমলে-কঠোরে গড়া এক বাস্তব বাদী

ব্যাক্তিত্বময়ী নারী।

চারিদিকে গাছ গাছালিতে ভরা পল্লী প্রকৃতির সুনিবিড় সান্নিধ্য। মনোরম পরিবেশ আর একদল মনের মত সঙ্গী। খেলা ধুলো দৌড়ঝাপ, আকাশ–বাতাস সব কিছু নিয়ে ছোট মার্গারেট ব্যস্ত। ওইটুকু বয়স থেকে তার মধ্যে নেতৃত্ব করার ইচ্ছা খুব প্রবল। তবে রাত হলে পিতামহীর গলা জড়িয়ে ঘুম। মাঝে মাঝে ঘুম আসতে চাইতো না। পিতামহী তাকে নানান গল্প বলে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করতেন। কখনও সদা প্রভুর কখনও মহান পরিত্রাতা যীশুর বাইবেলের গল্প। আবার কখনও নানান দেশের রাজা রানীর গল্প। আয়ার্ল্যান্ডের মুক্তি যুদ্ধের গল্প। কখনও বা ভূত–প্রেত–দত্যি দানার গল্প। তবে অন্য বাচ্ছাদের মত ভূত–প্রেত দত্যি দানার গল্প ছোট্ট মার্গারেট এর একদম ভালো লাগে না। কোন গল্প তার না পছন্দ হলে সে তার ঠাকুমার মুখটা ছোট হাত দুটো দিয়ে চাপা দিয়ে দেয়। পিতামহী বুঝতে পেরে বলতেন, আচ্ছা, আচ্ছা, অন্য গল্প বলছি। কখনও বা গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে ছোট মার্গারেটের পিঠ চাপড়ে দিতেন আলতো করে।

তার পিতামহী এক একদিন লক্ষ্য করতেন ওইটুকু বাচ্ছা এত সব কিছুর মধ্যেও মাঝে মাঝে কী যেন ভাবে আনমনা হয়ে। পথের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। যেন কার আসার অপেক্ষা করে। উদাস চাহনি। বিষন্ন দৃষ্টি। পিতামহী বুঝতে পারেন। সান্ত্বনা দেন, এই তো আর কটা দিন মাত্র। তারপর তোর বাপ–মা এসে নিয়ে যাবে। মার্গারেটের মনে সঙ্গে সঙ্গে খুশির খুশবু।

খুব বেশিদিন অবশ্য মার্গারেটকে তার পিতামাতার সঙ্গ ছেড়ে থাকতে হয়নি। কয়েক বছর পর তার পিতা ধর্ম যাজকের পদ লাভ করে ওল্ডহ্যামে চলে আসেন। এখন সংসার কিছুটা হলেও সচ্ছল। ইতিমধ্যে

তার একটি ফুটফুটে বোন মে'র জন্ম হয়েছে। পুরো নাম মেরী হ্যালিফ্যাক্স। মার্গারেটের থেকে দু'বছরের ছোট। মার্গারেট ওল্ড হ্যামে বাবা মায়ের কাছে চলে এলো। অনেকদিন পর বাবা মাকে কাছে পেয়ে সে খুব খুশি।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মার্গারেট হাঁপিয়ে উঠল। ওল্ডহ্যামের শহরের আকাশ বাতাসে সে যেন বিদেশীর গন্ধ পায়। এখানে তার প্রানের সুর সহজ ছন্দে খেলেনা। এখানকার মানুষজন তার বড় অপরিচিত মনে হয়। তার শিশু মনে একটা বিষণ্নতার চাদর চেপে বসে। সে মনে মনে প্রার্থনা করে এক মুক্ত আকাশের। টাটকা বাতাসের। হাসিমুখো মানুষের।

কে যেন তার মনের কথা শুনতে পেল। কিছুদিনের মধ্যেই তার পিতা ওল্ডহ্যাম ছেড়ে চলে আসেন টরেন্টনের এক গ্রাম্য পরিবেশে। স্যামুয়েল রিচমন্ড ছিলেন এক নিরলস-কর্মযোগী মানুষ। বৈচিত্রহীন জড়ের মত জীবন তিনি একবারেই পচ্ছন্দ করতেন না। ধর্মের সঙ্গে, আদর্শের সঙ্গে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মিশেলে তিনি এক উন্নত জীবন যাপনের স্বপ্ন দেখতেন। ফলে যখনই কোন সুযোগ এসেছে তিনি কর্মস্থল বদল করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি।

মার্গারেট যখন পিতার সঙ্গে টরেন্টনে আসে তখন সাত ছাড়িয়ে আট–এ পড়েছে। টরেন্টনের পল্লী প্রকৃতি, তার মানুষজন, পশু-পাখি, গাছ-গাছালির অনাবিল সঙ্গে মার্গারেটের প্রানের সুর আবার স্বাভাবিক। সে এখন অনেক কিছু বুঝতে শিখছে। মায়ের সহনশীলতা, দায়িত্ববোধ, শান্তশ্রী স্বভাব তার মনকে ভীষণভাবে ভরিয়ে তোলে। তবে তার পিতার জীবন তাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। সে তার পিতার অত্যন্ত প্রিয়। পিতার উপাসনা পদ্ধতি, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে

সুললিত গম্ভীর ভাষণ তার কিশোরী মনকে খুব নাড়া দেয়। বাইবেলের বিচিত্র কাহিনী শুনে শুনে তার মনে সৃষ্টি হল এক রহস্যময় জগৎ। পিতার আবেগময় প্রার্থনা তাকে নিয়ে যেত এক কল্পনার রাজ্যে। সে মনে মনে অনুভব করার চেষ্টা করত। সেই না দেখা জগতের ঈশ্বরের একটা অস্পষ্ট ছবি উঁকি দিত তার ছোট মনে।

পৃথিবীতে যেমন রাত-দিন, তেমনি সুখ-দুঃখ। কোন কিছুই এক সরল গতিতে চলে না। সংসারের সকলের সঙ্গে যখন তার দিনগুলো হেসে খেলে ভেসে যাচ্ছিল এমনি সময়ে তার জীবনে অকস্মাৎ মৃত্যু এসে হানা দিল। পিতামহী মার্গারেট এলিজাবেথ নীলাস কয়েকদিন অসুস্থতার পর হঠাৎ মারা গেলেন। তিনি তার জীবনের অনেকখানি ! শৈশবের অনেকগুলো বছর তাঁর সান্নিধ্যে কেটেছে। পিতামহীর মৃত্যুতে সে গভীর আঘাত পেল। তার বাবা–মা বোঝালে তার পিতামহী স্বর্গে গেছেন। সে উদাস দৃষ্টি মেলে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। কিশোরী মনে হাজারো প্রশ্ন। মানুষ কোথা থেকে আসে? কোথায় যায়? কেন আসে? আসে যদি চিরদিন থাকে না কেন? কে এসব ঠিক করে? খুঁজে খুঁজে বই পড়ে। বাবাকে নানা প্রশ্ন করে। চেনাশুনা মানুষজনকে জিজ্ঞেস করে। কেউ উত্তর দেয়, কেউ দেয় না। উত্তর যা পায় তাতেও তার মনের প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব পায় না। তার বাবা তার অনেক প্রশ্নের উত্তর দেয় বটে কিন্তু বড্ড যেন দায় সারা। তার মনে কোথায় যেন একটা অতৃপ্তি। একটা অসন্তুষ্টি।

বাবার সঙ্গে একদিন ঘরে বসে ধর্মকথা, বাইবেলের গল্প, ঈশ্বরতত্ত্ব শুনছে এমন সময় তার পিতার এক ধর্মযাজক বন্ধু এলেন তাদের বাড়িতে। তিনি ধর্মযাজক হিসেবে সদ্য ভারতবর্ষ ঘুরে এসেছেন। ভারতবর্ষের নানা গল্প বলছেন গভীর ভাবে। হঠাৎ তিনি

লক্ষ্য করেন ছোট মার্গারেট তন্ময় হয়ে শুনছে ভারতবর্ষের গল্প। বাচ্ছারা ধর্মকথা শুনলে হয় হাই তোলে, নয়তো সেখান থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু মার্গারেট অন্যদের মতো নয়। তিনি মার্গারেটের বুদ্ধিদীপ্ত চোখ,ধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগ ও নতুন দেশের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা দেখে ভবিষ্যৎ বাণী করলেন – ভারতবর্ষ একদিন তোমাকে ডাক দেবে।

এই কথা ঠিকঠাক বোঝবার বয়স তখনই হয়নি মার্গারেটের। সে নিজের মনের গভীরে ঢুকে ভাবে সে কেন ভারতবর্ষে যাবে? সে দেশ কোথায়? কত দূরে? সেখানে তার কাজ কী? সেখানকার মানুষজন কেমন? এই সব সাত পাঁচ যখন ভাবছে এমন সময় তার মা ঘরে ঢোকেন। মেয়েকে ওরকম গভীর ভাবে ভাবতে দেখে মা জিজ্ঞেস করে – কিরে, কী ভাবছিস অমন গম্ভীর হয়ে? বুঝিনা বাপু, তোর এই বয়সে এতো কিসের ভাবনা? বাবা মেয়ের দিকে লক্ষ্য করে নিজের স্ত্রীকে বললেন– দ্যাখো, যদি মার্গারেটের জীবনে কোন বৃহত্তর ডাক আসে তুমি যেন ওকে বাধা দিও না। ওকে ওর পথে চলতে দিও। মার্গারেটের আর একটি ছোট ভাই হয়েছে– রিচমন্ড নোবল। তার থেকে প্রায় ১০ বছরের ছোট। ছোট ভাইকে সে খুব স্নেহ করে। তাদের ছ'ভাই–বোনের মধ্যে এখন তারা মাত্র তিন ভাই–বোন বেঁচে আছে – সে, বোন মে ও ভাই রিচমন্ড।

স্নেহশীল পিতার গভীর প্রভাবে মার্গারেটের মনে পড়াশুনার সঙ্গে গড়ে ওঠে ধর্মের এক অপূর্ব মেলবন্ধন। অকস্মাৎ আবার ছন্দপতন। কঠোর পরিশ্রম আর দুশ্চিন্তায় অনেকদিন ধরে স্যামুয়েলের শরীর ভালো যাচ্ছিল না। ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে যক্ষা রোগে তিনি মারা গেলেন। পিতা যখন মারা যান তখন মার্গারেটের বয়স মাত্র দশ বৎসর। স্যামুয়েল নোবেল ছিলেন আদর্শের পূজারী। অর্থ

উপার্জনকে তিনি কখনও প্রধান লক্ষ্য করেন নি। ফলে তাঁর জীবিত কালেই মাঝে মাঝে অর্থসংকট দেখা দিত। মৃত্যুর পরে সংসার অচল প্রায়। পরিবারে আর কেউ উপার্জনক্ষম নয়। তিন তিনটে বাচ্চা নিয়ে মার্গারেটের মা পড়লেন মহা বিপদে। বিদেশ বিভুঁই। তেমন কোন আত্মীয়–স্বজন কেউ নেই। তিনি বাধ্য হয়ে দুই কন্যা ও পুত্রকে নিয়ে আয়ার্ল্যান্ডে পিতা হ্যামিলটনের কাছে চলে এলেন।